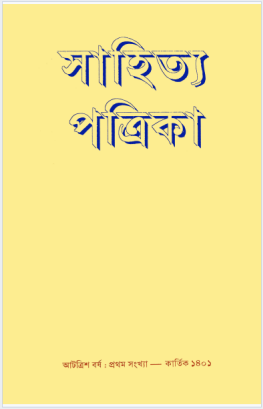

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী আবদুল ওদুদ

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ ইদরিস আলী
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.1
Pages	9-26
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

কাজী আবদুল ওদুদ

মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী

মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খণ্ডকালীন লেকচারার ছিলেন। পরে শিক্ষাবিভাগে সরকারি চাকুরিতে যোগ দিয়ে ১৯৬৯ সালে অবসর নেন। ১৯৬৯-৭২ সালে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন সহকারী অধ্যাপক রূপে; ১৯৭২-৭৪ সালে ছিলেন সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক। ১৯৭৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্য সমালোচনায় ও গবেষণায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সংখ্যায় বেশি না-হলেও তাঁর লেখা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। *অলস দিনের অবান্তর হাওয়া* তাঁর একটি বই: তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

১৯৪৮ সালে রচিত বর্তমান প্রবন্ধটি তাঁর অপ্রকাশিত রচনাসমূহের একটি। কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার ভিত্তিতে লেখা বলে রচনাটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের জীবনকথা, অবদান ও সেকালের প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করার প্রয়াসও এতে রয়েছে। এটা পাওয়া গেছে লেখকের কন্যাজামাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহতাবউদ্দিন আহমদের সৌজন্যে।

মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলীর এই রচনাটিতে তাঁর অনুসৃত বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। রচনায় বর্তমান সময়, এখন, সম্প্রতি ইত্যাদি ১৯৪৮ সাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৩০১ সালে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৪ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে কাজী আবদুল ওদুদ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি ও বাসস্থান হইল ফরিদপুর জিলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে। ইঁহাদের পূর্ব বাস অবশ্য পদ্মার ওপারে পাবনা জিলার কসবা নামক স্থানে। কাজী সাহেবের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কাজী আবদুল মালেক প্রথমে সেখান হইতে বর্তমান স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, এবং তখন হইতেই ইঁহারা পুরুষানুক্রমে এখানে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। পিতা কাজী সৈয়দ হোসেন, পিতামহ কাজী মোহাম্মদ ইয়াছিন। পিতা একজন আত্মীয়বৎসল মহৎহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ছিলেন স্বভাবকুলীন (অর্থাৎ আভিজাত্যের একটা স্বাভাবিক পরিবেশ তাঁহার চরিত্রে বর্তমান ছিল)। আবেগ-প্রাবল্য ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বেশী লেখাপড়া তিনি করেন নাই বা করিতে পারেন নাই; তবে তাঁহার অসম্ভব ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল।

মাতামহ পাঁচু মোল্লা। বাসস্থান – নদীয়া জেলার চাঁদপুর গ্রাম। মোল্লা সাহেব লেখা-পড়া-জানা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী জবরদস্ত এই লোকটিকে জমিদার পর্যন্ত খাতির করিয়া চলিত। জমিদার কুঠিতে বা কাছারীতে তাঁহার জন্য একটি আসন বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাঁহার অভাবে বা অনুপস্থিতিতে জমিদার কাছারির কোন কাজই মীমাংসিত বা চূড়ান্ত করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। সেই সময় যখন দেশের সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজে, ইংরাজী লেখাপড়ার প্রচলন হয় নাই তখন মোল্লা সাহেব আপন সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। কাজী সাহেবের মাতা ইঁহার প্রথম সন্তান। তিনি বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন, এবং ধীরস্থির বিবেচনা সম্পন্ন প্রকৃতির অধিকারিণী ছিলেন।

শিক্ষা ও অধ্যয়ন

কিছু বেশী বয়সেই তিনি বিদ্যালয়ের সংশ্রবে আসেন। নয় বৎসরের সময় মামা বাড়ী থাকিয়া তিনি নিকটস্থ জগন্নাথপুর এম ই স্কুলে ভর্তি হন। তাহার পূর্বে অবশ্য তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছিল। নিজের বাড়ীতেই ৫/৬ বৎসরের সময়ে তাঁহার অক্ষর পরিচয় হয়। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্বে তিনি ইংরাজী first book পড়েন। মামাবাড়ী থাকিয়া তিনি এই স্কুলে এক বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি মধুসূদন রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিজেও পাঠ করেন। ইহার পর ঢাকা আসিয়া শহরস্থ 'ইম্পিরিয়াল সেমিনারী' স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ৩/৪ মাস পরেই তিনি এখান হইতে সাটির পাড়া স্কুলে চলিয়া যান। মামা মৌলভী নজিরউদ্দিন আহমদ তখন নরসিংদি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁহারই বাসায় থাকিয়া তিনি এই

স্কুলে পড়িতে থাকেন। চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া এখানে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তিন বৎসর (১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৮) পাঠ করেন। ইহার পর এক বৎসরের জন্য পাবনা ইন্‌সটিটিউশনে পড়েন। সপ্তম শ্রেণী সেখানে কাটে (১৯০৮)। মামা ঢাকার রূপগঞ্জ থানায় বদলি হইয়া যান। তাঁহার বাসায় থাকিয়া তিনি মুড়াপাড়া-স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করেন। দশম শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চলিয়া আসেন এবং সেই স্কুল হইতেই তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার দরুণ তিনি ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পান। স্কুলে পাঠকালে তিনি প্রতি ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। কলেজিয়েট স্কুলে থাকার সময়ে রচনা প্রভৃতি লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯১৫ ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে আই-এ ও বি-এ পাশ করেন, এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Political Economy বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এম-এ পড়িবার সময়ে এক সঙ্গে তিনি আইনও পড়িয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময় প্রথম তিন বৎসর তিনি বেকার হোস্টেলে থাকেন। চতুর্থ বৎসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ এবং ল' পড়িবার সময় তিনি তাঁহার মামার বাসায় থাকিয়া পড়া লেখা করেন। মামা দারোগা নজির উদ্দিন আহমদ সাহেব তখন কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াছিলেন।

বিবাহ ও পুত্র কন্যাদি

১৩২২ সালের ৭ই ফাল্গুন তিনি বিবাহ করেন। তখন তিনি বি-এ ক্লাসের ছাত্র। পাত্রী তাঁহার মামাতো ভগ্নি;- মৌলভী আস্‌হাব উদ্দিন সাহেবের প্রথমা কন্যা। মামা পুলিশ সব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টর ছিলেন। কাজী সাহেবের দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয় পুত্র বর্তমানে বি এস-সি পড়িতেছে। কন্যাটি রুগ্না।

চাকুরী

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া তিনি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাঙ্গালা ভাষাসাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। Economics লইয়া যিনি এম-এ পাশ করিলেন তিনি বাঙ্গালা ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এ ব্যাপারটা কিছু বিসদৃশ ঠেকিবে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা-সাহিত্যের উপর তাঁহার দখল ও সাহিত্যচর্চার ক্ষমতা বিবেচনা করিয়াই তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এম এ পরীক্ষা দেওয়ার পর তিনি কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত *মুসলিম-ভারত* পত্রিকায় 'সাহিত্যিকের সাধনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের সপ্রশংস সমালোচনা করেন প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'সবুজপত্রে'। বাঙ্গালা ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপনায় কাজী সাহেবের নিযুক্তির মূলে ছিল

এই প্রবন্ধ এবং এই সমালোচনা। যাহা হউক, এক বৎসরের মধ্যেই অধ্যাপক হিসাবে তিনি আপনার যশঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া লন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া এই কলেজেই অধ্যাপনা করেন। এই খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার প্রাদেশিক টেক্স্ট বুক কমিটির সেক্রেটারী ও রীডারের পদ সৃষ্টি করেন এবং তিনি সেখানে নিযুক্ত হইয়া উক্ত অব্দের মে মাসে কলিকাতায় গভর্ণমেন্ট সেক্রেটারিয়েটে চলিয়া আসেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫ই আগষ্ট হইতে Registrar of Publication-এর পদ ইহারই সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন এবং কাজী সাহেব ঐ যুক্তপদে নিযুক্ত থাকেন। বর্তমানে তিনি এই পদেই নিযুক্ত আছেন।

সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যিক জীবন

স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই অবশ্য কাজী সাহেব প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতিতে আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং মধুসূদনের কাব্যপাঠ প্রভৃতির সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। তথাপি সাহিত্যের দিকে তাঁহার প্রকৃত দৃষ্টি পড়ে প্রথম যখন তিনি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন তখন, এবং তখনই মাত্র তিনি সাহিত্যের রসবস্তুর প্রথম সন্ধান পান।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইবার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কয়েকদিন এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রূপগঞ্জ থানায় কাজী সাহেবের মামার সঙ্গে সেকেন্ড অফিসার রূপে যে ভদ্রলোক কাজ করিতেন তাঁহার শ্বশুর ছিলেন ইনি। অপরিচিত স্থানে নূতন আসিয়া অসুবিধা হইবে জানিয়া মামা এই অফিসারটির পরিচয়েই তাঁহাকে এই বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বাড়ীর কর্তা ভদ্রলোকটি সম্ভবত ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার বাসায় প্রায়ই বন্ধুবান্ধব সমাগম হইত এবং রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলির* গান গীত হইত। এই গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মে। অন্তরের আগ্রহে তিনি *গীতাঞ্জলি* পুথিখানি কিনিয়া আনিয়া পাঠ করেন, এবং আনন্দ পান। রবীন্দ্রকাব্য পাঠ এই তাঁহার প্রথম; আমরা জানি সাহিত্য-রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। কেননা সাহিত্য পাঠে আনন্দ লাভের চেষ্টায় পুঁথি খরিদ করা কাজী সাহেবের জীবনে ইহার পূর্বে আর হয় নাই। এই কাব্যপাঠ তাঁহাকে যে আনন্দ দিয়াছিল তাহারই আকর্ষণে তিনি আরও বেশী করিয়া রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিতে থাকেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যখন পড়া আরম্ভ করেন তখন তিনি বেকার হোষ্টেলে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যে হোষ্টেলের ছাত্র মহলে তাঁহার নাম হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা বুঝিতে পারে, বা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কথা বলিতে পারে, এমন যদি কেউ থাকে তো সে মাত্র তিনি। রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে কোন সমস্যার সমাধানকল্পে ছাত্রের দল তাঁহারই

নিকট আসিয়া হাজির হইত। এই সময়ে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিরও কিছু উন্মেষ হয়। তাহার প্রকাশ পাওয়া যায় এখানে তাঁহার যুগধর্মের প্রতি নিষ্ঠায়। গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী চলিয়া আসিয়া যাহা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা জিজ্ঞাসায় মানিতে হইবে। যুগের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যাহা শুধু অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়ায় তবু প্রচলিত আছে বলিয়াই তাহাকে প্রণতি জানাইয়া চলিতে হইবে ইহা হইতে পারে না। সভ্য মানবের অগ্রসর মনোভাব সর্বদা সজাগ রাখিতে হইবে, আর যুগে যুগে নব পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলাইয়া তাহার চলা চাই। এ বিশ্বাস কাজী সাহেবের অন্তরে কতখানি দৃঢ়বদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ আমরা পাই তখনকার বেকার হোস্টেলের 'হোস্টেল বার্ষিকী'তে। হোস্টেল হইতে তখন হাতে লিখিয়া পত্রিকা প্রকাশ করা হইত। কাজী সাহেব তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। প্রবন্ধের শেষে নামের স্থানে প্রকৃত নাম না লিখিয়া লিখিতেন 'শ্রী-দীক্ষিত'। বিশ্বাসে তিনি পরিপূর্ণভাবেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার বক্তব্য ছিল।

প্রকাশ্যভাবে সাধারণ সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি আসিয়া উপস্থিত হন যখন, তিনি বি-এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন তখন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বসিয়াছেন এবং বাজারে তাঁহার পুঁথি প্রকাশ হইতে শুরু হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার লেখা লইয়া বিশেষ সমালোচনা কিছু হয় নাই। শুধু এক স্যার জগদীশ চন্দ্রই তখন তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন মাত্র। এই অবস্থায় কাজী সাহেব শরৎচন্দ্রের *বিরাজ-বৌ*-এর সমালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং *ভারতবর্ষে* তাহা ছাপা হয়। এই প্রবন্ধ তাঁহাকে তখনকার সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত করিয়া দেয়। প্রবন্ধ পাঠে লেখকের লিখিবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁহার বিবেচনা দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া রায়বাহাদুর জলধর সেন তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন। ইহার পর হইতে তিনি *প্রবাসী* প্রভৃতি পত্রিকাদিতে লিখিতে থাকেন। বি-এ পড়িবার সময় হইতেই তিনি ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম গল্প হইল 'আশরাফ হোসেন'। এম-এ প্রথম বর্ষে থাকাকালীন তিনি এই গল্পটি ও আরও চারিটি গল্প একত্র করিয়া *মীর পরিবার* নামে পুঁথি প্রকাশ করেন। এই পুঁথি পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র কাজী সাহেবকে প্রশংসা করিয়া পত্র দেন।[১] অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে কাজী সাহেব একেবারে তৈয়ার হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। সত্যই আমরা কাজী সাহেবের সাহিত্যিক জীবনের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহার এক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি করার কোন কালের খবর পাই না। তিনি যেন একেবারেই প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ আসিয়া হাজির হইয়াছেন। ইহার কারণ হইল তাঁহার সংস্কারমুক্ত বিচারপ্রবণ মন। আপন মনের সমালোচনাই তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে সুষ্ঠু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল।

কাজী সাহেব পাঠে প্রকৃত স্বাদ ও যথার্থ আনন্দ পান যখন তিনি এম-এ পড়িতে থাকেন তখন। এখানে তাঁহার বিষয় ছিল ECONOMICS ও POLITICS। তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল SOCIOLOGY। বোধ হয় এই পাঠই তাঁহাকে আমাদের সমাজ জীবন সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। কেননা তাঁহার পরবর্তী লেখা কি গল্প উপন্যাস, কি প্রবন্ধাদি সকল লেখার মধ্যে কিংবা সাহিত্যসমাজ লইয়া সকল আন্দোলনের মধ্যে সমাজের কল্যাণ কামনার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই। পাঠের সঙ্গে তাঁহার লেখাও চলে। এম-এ পড়িবার দ্বিতীয় বৎসরে তিনি একখানি উপন্যাস (*নদীবক্ষে*) রচনা ও প্রকাশ করেন।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় *মুসলিম ভারত* মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাজী সাহেব তখন এম-এ পাশ করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংখ্যাতেই তিনি 'সাহিত্যিকের সাধনা' শীর্ষক এক সুচিন্তাপূর্ণ সমস্যা-সমাধান মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে তখন 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী ও তাঁহার *সবুজপত্র* বিশিষ্ট পরিচয়ে অধিষ্ঠিত। এই পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয় কাজী সাহেবের এই প্রবন্ধে এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। তাহাতে তিনি প্রবন্ধকারের চিন্তা ও বিবেচনা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন কাজী সাহেবের ইংরাজী শব্দগুলির তর্জমায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহারের সুষ্ঠুতার। পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে এই প্রবন্ধ ও সমালোচনা তাঁহার চাকুরী লাভে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। বিচার প্রবণ মন তাঁহার সম্ভবত এইখানে একটু অত্যন্ত বেশী ভাবেই সজাগ হইয়াছিল। কেননা আমরা এই সময়ে তাঁহাকে তৎকালের কয়েকটি সমস্যা লইয়া পরপর বিচারমূলক প্রবন্ধ লিখিতে দেখি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার দরুন যে স্পষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে কিছু বিক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়। নিজের বিবেচনায় ও বিচারে যদি সায় না হইয়াছে তবে সুপ্রতিষ্ঠিত জনের মত হইলেও তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনায় তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *মুসলিম ভারতের* জন্য 'নন্‌কোয়াপরেশন বা অসহযোগিতা' নামক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। পত্রিকার ২য় খণ্ড মাঘ ও পৌষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে তাহা প্রকাশিত হয়। সরকারী চাকুরিয়া তিনি, তাই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই তিনি ছদ্মনামে ইহা প্রকাশ করেন। ছদ্মনাম ছিল- আব্দুল্লাহ আল আজাদ। বিপ্লবী বারীণ ঘোষ তাঁহার নিজের পত্রিকায় এই প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া সমালোচনা করেন। তখনকার অন্যান্য পত্রিকায়ও ইহার সমালোচনা ও প্রশংসা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রবন্ধ মুদ্রণের জন্য লেখকের সন্ধান না পাইয়া সরকার পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধমকাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে "গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ" নামে এক প্রবন্ধ লিখেন। অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা লইয়া গান্ধী তখন দেশকে

মাতাইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের বিপক্ষতাচরণ না-করিলেও চরকার প্রতি তাঁহার প্রীতির কিছু অভাব ছিল। কাজী সাহেব আপন প্রবন্ধে গান্ধী-মতেরই পরিপোষকতা করেন। এই প্রবন্ধ তৎকালে প্রচলিত *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এই পত্রিকায়ই তিনি 'শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সত্যের ভূগোল লইয়া দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কাজী সাহেব রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া লেখেন যে, সত্যকে কোন ক্ষেত্র বা কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা চলে না। ইহা শাশ্বত, চিরন্তন। এই প্রবন্ধাদি ১৩২৭-২৮ সালে দুই বছরের মধ্যেই লেখা হয়।

ইহার পর কাজী সাহেবের দীর্ঘকাল চুপচাপ করিয়া কাটে। কোন লেখা বা রচনার প্রয়াস বা প্রকাশ এই সময়ে হয় নাই। কিন্তু বহির্প্রকাশের দিক হইতে এই সময়টা একেবারেই নিশ্চুপে কাটিলেও ইহা তাঁহার আভ্যন্তরীণ গঠনের যুগ। জ্ঞানের গভীরতা ও উপলব্ধির ব্যাপকতার যুগ ইহা। এই সময়ে তিনি গভীরভাবে পাঠে মনোযোগ দেন, এবং সাদী, রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলাঁ, গান্ধী প্রভৃতিকে পাঠ করিতে থাকেন। এই পাঠে বিস্তৃতির অপেক্ষা গভীরতার প্রতিই লক্ষ্য ছিল বেশী। মন যখন এমনিভাবে আপনার তলদেশ মন্থন করিবার কাজে লাগিয়াছে, দৃষ্টি তখন তেমনি সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শুরু করিয়াছে। এম-এ পাশ করিবার পর হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার যে সাধনার পরিচয় আমরা পাই তাহাতে দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিই তাঁহার কাছে প্রধান হইয়া রহিয়াছে, বুদ্ধিগ্রাহ্য যাহা তাহাতেই বিবেচনা আসিয়া তাহারই সঙ্গে যুক্ত হইল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (moral and spiritual) ভাবটি।

নীতির দিক হইতে তাঁহার মধ্যে যে নূতনত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটিতে আমরা দেখি তাহা হইল তাঁহার সামাজিক চেতনা। জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এই সময়ে তাঁহার মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার ধর্মোপলব্ধির মধ্যে। ধর্ম বলিতে তিনি প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান ভরা সাধারণ মানুষের হৃদয়াবেগের অন্ধতাকে গ্রহণ করেন নাই। ধর্মপালন অর্থে তিনি বুঝিয়াছেন মনুষ্যত্ব-সাধনা এবং তাহাই পরিপূর্ণরূপে করিতে যাইয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন বুদ্ধির মুক্তির। এতদুভয়ের সমন্বয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার ধর্মবোধ। পরবর্তীকালে 'নবপর্য্যায়ে'র যে প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহার মূলে রহিয়াছে এই নবলব্ধ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা।

এই সময়ের মধ্যেই একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা তাঁহার মনে চলিতে থাকে। মনে করেন 'আজাদ' নামে একখানি উপন্যাস লিখিবেন, চারটি খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হইবে। শুধু পরিকল্পনাই নয়, তাহাকে রূপদানের চেষ্টাও এই সময়ে

চলে। কিছুকাল লেখা এবং সংশোধন চলিবার পর ইহার প্রথম খণ্ড 'খেলাধুলা' নামে কবি আব্দুল কাদির সম্পাদিত *জয়তী* পত্রিকায় ১৩৩৭ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আরও একটি কাজ লইয়া তাঁহাকে এই সময় ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। তাহা হইল তাঁহার সঙ্গীত সাধনা। চাকুরীতে যোগদানের পরেই তিনি গান শিখিতে প্রবৃত্ত হন। পড়া, 'আজাদ'কে রূপদানের চেষ্টা, প্রভৃতির সঙ্গে গান শিখিবার প্রয়াসও তিনি এই সময়ে করেন। গান শেখা যেমন তেমনি নিজের খেয়ালখুশীমত সুর লইয়া খেলাও করিতে থাকেন। হাফিজের গজল পাঠের সঙ্গে তাহাতে নিজের মন-মত-সুর দিয়া গাহিবার চেষ্টাও চলিতে থাকে।

লেখা হইবার কয়েক বছর পরে *আজাদ*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই লেখার মধ্যে তাঁহার ভাষায় যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বস্তু। ইহার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার ভাষা গম্ভীর ও গুরু চালের। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্যই যখন বর্তমান ছিল তখন ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতাই হয়ত তাঁহার ভাষাকে অসহজ ও ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্র আজ তাঁহার দখলে; উপলব্ধির ব্যাপকতায় রসানুভূতির বিভিন্নতা তাঁহার অন্তর-মনে বিচিত্র আন্দোলন আনিয়াছে। প্রকাশভঙ্গিতে ও ভাষার অবয়বে আমরা সেইজন্যই পরিবর্তন দেখিতে পাই। ভাষা প্রবল গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহার মধ্যে চলমান সজীবতার ঠাঁই হইয়াছে। ক্রমে ইহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। প্রকাশের আবেগ এবং অনুভূতির তীব্রতাও এইখানে এইসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দীর্ঘ চুপচাপের পর পুনরায় কাজী সাহেব রচনা ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন ১৩৩১ সালে। ঐ বৎসরের *মোহাম্মদীর* কোন বিশেষ সংখ্যায় তিনি 'মানবমুকুট' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহা এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবের রচিত গ্রন্থ *মানব মুকুটের* সমালোচনা। চৌধুরী সাহেবের পুঁথির সাহিত্যিক-সমালোচনা ইহাই প্রথম।

ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ

কাজী সাহেবের সাহিত্যিক জীবন ও সাধনার অন্যতম প্রধান ও বিশিষ্ট কীর্তি হইল ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ লইয়া ঢাকায় যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে একটা স্থায়ী রেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানান্বেষী সত্যসন্ধানী যুবকদল ও চিরাগত প্রথানুসারী অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের দল উভয়েই এই আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই বিক্ষোভের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য জীবনে দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়া যায়, এবং আজ পর্যন্ত তাহা রহিয়া গিয়াছে। নব গঠিত দলের দৃষ্টি রইল সহজ বুদ্ধির বিচারের দিকে। মানুষের প্রয়োজনকে পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীতে ধরিয়া লইয়া মানুষের চিন্তাকে সর্ব সংস্কার

হইতে মুক্ত রাখিয়া আপনার সাধন-পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলা হইল ইহাদের কুণ্ঠাহীন প্রয়াস, এবং এই দিকেই ইহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়া রাখিল নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং কাজী সাহেব স্বয়ং। আর অন্যদল চলিল সাধারণ গতানুগতিক পন্থায়। তাহাদের কোন বিশেষ নীতি অনুসরণের চেষ্টা ছিল-এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। উভয়ের দৃষ্টি হইল সাহিত্য সাধনা, তবু উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিল। এই বিবাদ যে সম্পূর্ণরূপে শুধু আমাদের অকল্যাণই করিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তবু ইহা যে রূপ পাইল তাহা আমাদের জন্য নিরতিশয় লজ্জার ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে।

১৩৩২ সালের ৩রা মাঘ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিন এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বুদ্ধির মুক্তি সাধনা যাঁহার অন্তরে তাঁহারই নিকটে শিক্ষা ক্রমে অগ্রসর মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকদল গড়িয়া উঠিতেছিল। নবপ্রেরণালব্ধ উৎসাহী এই যুবকদের অন্তরে ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নির্ণয়ের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ বর্তমান। বাঙ্গালা তথা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রেও তখন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খেলাফৎ আন্দোলন প্রভৃতি লইয়া বড় অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কোন্ পথে যাই- এই প্রশ্ন তখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ও প্রাণবান ব্যক্তির সম্মুখে। কে তাহাদের পথ দেখাইবে? এমনি সময়ে কাজী সাহেব উল্লিখিত সনের জানুয়ারী মাসে ঢাকা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে "মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা"-নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণে যুবকদল তাঁহাকেই আসিয়া ধরিয়া বসে যে পথ দেখাইয়া লইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম নির্দ্দেশের দায়িত্ব তিনিই যেন গ্রহণ করেন। সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলোৎপত্তি এইখানেই। পরলোকগত অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেবের নাম এই সঙ্গে অবশ্যই করিতে হয়। ঢাকার মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম নায়ক। উৎসাহী মন লইয়া নিজের ধরনেই দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যুগোপযোগী একটা আন্দোলন আনিবার চেষ্টায় তিনি রত ছিলেন। মুসলিম হলে যখন কাজী সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ হয়, অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব তাহারই সমসাময়িককালে নিজের প্রচারিত *তরুণ* পত্রে তরুণদিগকে সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। এতদুভয়ের চেষ্টার ফলে তরুণ দল অনুপ্রাণিত হইয়া ইঁহাদেরকে লইয়াই দল গঠনে ব্রতী হয়। পূর্বে তাঁহার মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন কাজী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব তাঁহারই মতানুসারী হইয়া ওঠেন। উভয়ের ভাবের সমন্বয় সত্যই এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। একের মনে সংস্কারহীন মুক্তবুদ্ধিজাত ভাবের প্রেরণা, অপরের কর্মপ্রবণ হৃদয়ে অফুরন্ত শক্তির উৎস। এইভাব ও শক্তির সমন্বয়ে সমাজের প্রতিষ্ঠা। ইঁহাদের দুই জনের, সেই সঙ্গে অগ্রসর কয়েকটি ছাত্রের (তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখের হলো আব্দুল মজিদ ও আব্দুল কাদির) উৎসাহ ও যত্নে সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য

ইতোপূর্বে উল্লিখিত তারিখে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সমিতির নামকরণ হয় "ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ"। চারজন সহকারী লইয়া একজন সম্পাদক নিযুক্ত হন প্রধানতঃ তাঁহারাই সমাজের কার্য চালাইবেন। প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন অধ্যাপক আবুল হুসেন। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আনোয়ারুল কাদির, মুহম্মদ আব্দুল রশিদ প্রমুখ সমাজের সভ্য হিসাবে থাকেন। প্রথমবারের সহকারী সম্পাকদের মধ্যে নাম করা যায় আব্দুল মজিদ ও আব্দুল কাদিরের। সমাজের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে- প্রতিমাসে ইহার অন্ততঃ একটি বৈঠক করা এবং সেখানে প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার আলোচনা করা। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করাও এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে সমাজে মন্ত্রদাতা ছিলেন কাজী সাহেব এবং ইহার কর্মশক্তির যাবতীয় উৎস ছিলেন অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব। অবশ্য তাঁরই সঙ্গে সহযোগে কাজ করিয়াছে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্রদল।

সমাজ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে ইহার একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন তসদ্দুক আহমদ সাহেব। মুসলিম সমাজে কাব্য প্রতিভার প্রকাশ দিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি এই অধিবেশনে তখন যোগদান করিয়া ইহার মর্যাদা বাড়াইয়া তোলেন। ইঁহাদের লইয়া এই বৈঠকের যে আয়োজন হয় তাহাতে শহরময় এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক উৎসাহী ব্যক্তি বিশেষত যুবকবৃন্দ প্রাণে মনে অনুভব করিলেন যে সত্যই কিছু একটা হইতেছে যাহা তাহাদের পক্ষে, সমাজ ও দেশের পক্ষে, আনন্দের ও কল্যাণের। তাঁহারা যেন মাতিয়া উঠিলেন। এই সঙ্গে আবুল হুসেন সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, সমাজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ইহার একখানা মুখপত্র থাকা চাই। আবুল হুসেন সাহেব নিজেই উদ্যোগ করিয়া এবং নিজেরই অর্থব্যয়ে *শিখা* নাম দিয়া একখানি বার্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। সমাজের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত প্রবন্ধ কবিতাদি লেখা হইত তাহাই লইয়া এই পত্রিকা বাহির করা হইত। ইহারই মধ্যে থাকিত সমাজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এবং কার্যকলাপের পরিচয়। পত্রিকার প্রথম পাতায়ই যে পংক্তিটি লেখা থাকিত তাহা হইতেই ইহার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইত। কথাটি আবুল হুসেন সাহেবের রচনা- "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" ইহার প্রচ্ছদপটখানিও সমাজের উদ্দেশ্যের দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া বর্তমান ছিল। সমাজ ও ইহার মুখপত্র লইয়া যখন ইঁহারা প্রকাশ্য আসরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন দেশে (প্রধানত ঢাকা শহরে) একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলে এবং ইহার সংস্পর্শে যাহারা আসিল তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিল, এবং কাহারও কাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া মুসলিম

হলের ছাত্রদের কাহারও কাহারও মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। এইখানে আরও একটি ব্যাপারের উল্লেখ এই সঙ্গে করিতে হয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মি. এ এফ রহমান (পরে স্যার) তখন অধ্যাপক এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রোভোষ্ট। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন তিনি। সেখানকার আদর্শে সুষ্ঠু শিক্ষা ও সঙ্গত চরিত্র গঠনে ঢাকার ছাত্রদিগকে তৈয়ার করিয়া তুলিবার চেষ্টায় তখন তিনি ব্যাপৃত। তাঁহারই সেই চেষ্টার সঙ্গে মিশিল সমাজের প্রেরণা। আপনাদের সুষ্ঠু প্রকাশের তাড়নায় একদিকে যেমন তাহারা সুন্দর হইয়া উঠিল অন্যদিকে সমাজের উৎসাহে প্রাপ্ত নবলব্ধ জ্ঞানের সাধনায় তাহারা তৎপর হইয়া রহিল। এতদুভয়ের মিশ্রণে ঢাকার মুসলিম সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাহার অপূর্ব প্রস্ফুটনে সাধারণের মধ্যে তাহারা বিশিষ্টতা অর্জন করিল। পাঁচ বছর ধরিয়া সমাজের কাজ নিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মনীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সমাজের কাজ ইঁহারা করিয়া যান। নিয়মিত বৈঠক, প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা, বক্তৃতা, বার্ষিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বার্ষিক *শিখা* প্রকাশও এই সঙ্গে চলিয়াছিল। প্রথম তিন বৎসর ইহার সমস্ত ব্যবস্থাই অধ্যাপক আবুল হুসেন করিতেন, এবং তাহার খরচাদি পর্যন্ত। পরে ইহা সমাজের ব্যবস্থায় ও ব্যয়ে চলে। বিবিধ এই কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে প্রবন্ধ বা আলোচনা সর্বক্ষেত্রে কাজী সাহেবকেই আমরা প্রধান ব্যক্তি হিসাবে দেখিতে পাই। তাঁহার চেষ্টায়ই যেন সমাজ আপনার সম্পদ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সমাজের জন্য তাঁহার অন্তরের দরদ আর যুবক দলের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তাঁহার হৃদয়ের তাগিদ তাঁহার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া থাকিত এবং সেইজন্যই মনে হইত সমাজের সমস্ত বিধি কর্তা যেন কাজী সাহেবই।

মঙ্গল চেষ্টাও বোধ হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিবার নয়, তাই বিরোধ আসিল। মানুষের পরিচয়ে সহজভাবে জগতে সংসারে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে দাঁড় করাইবার সাধনায় ইহাদের বিঘ্ন দেখা দিল। এই বিরোধ বা বিঘ্ন আসিল চিরাগত প্রথানুসারী দলের নিকট হইতে। তাহাদের মুখপত্র হইল প্রধানত *মোহাম্মদী* এবং তৎকালে প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক সোলতান*। কাজী সাহেবের 'নব পর্য্যায়'স্থ প্রবন্ধাদি, অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব লিখিত রচনাদি ও সমাজের কার্য্যকলাপের মধ্যে স্বাধীন মনোবৃত্তি ও মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন সহজ মানুষের স্বাভাবিকতার যে জয়গান ছিল বা চলিতেছিল তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া এই পত্রিকাদিতে রচনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে ঢাকায় সমাজের একটি বিরোধীদলের সৃষ্টি হইল এবং তাহাদের তৎপরতায় সমাজের সহজ কর্ম্মচেষ্টার ক্ষেত্রে বাধা আসিয়া পৌঁছিল। তাহারই তৎপরতায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সমাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল এবং কোন প্রকার বৈঠক বা অধিবেশন কিছুই আর চলিল না।

বলাবাহুল্য যে এ পর্য্যন্ত এখানেই সমাজের সমস্ত বৈঠকাদি হইয়া আসিতেছিল। শুধু এইখানেই নয়, ঢাকা শহরের মধ্যেও ইহার দরুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। শহরস্থ এই বিক্ষোভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তখনকার বলিয়াদির জমিদার ও ঢাকার নওয়াব সমাজের বিরোধিতা ইহার কাজ কর্ম্মের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মত ব্যক্তিদ্বয় যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাহার রূপ সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যায়।

ছাত্রদলের মধ্যেও একটা বিভেদের সৃষ্টি হইল তাহার কারণ রাজনৈতিক। বাঙ্গালা তথা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তখন সবেমাত্র রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের পশ্চাতে যে কথাটি প্রধান হইয়াছিল সে হইল জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য এবং তাহারই দাবীতে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিষ্ঠা। ভাবের ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে এইখানেই প্রধান দ্বন্দ্ব। কারণ সমাজের চেষ্টা ও মন্ত্র হইল মিলন; সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য না রাখিয়া, স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয়ে বিভেদের কথা না ভাবিয়া মানবতার দাবীতে এক হইয়া দাঁড়ানো ছিল সমাজের লক্ষ্য। বিরুদ্ধ দলের সুবিধা হইল- পার্থিব বা সাংসারিক উন্নতি প্রতিপত্তির দিকে মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিয়া চাকুরী বা পদলাভের অর্থকরী সুবিধা যাহারা অর্জন করিবার চেষ্টায় রত সংসারী লোক তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। ভবিষ্যৎ লাভের কথা ভাবিয়া যুবক দলেরও অনেকে বিরুদ্ধ দলে গিয়া যোগদান করিল। এই গোলমাল এক সময়ে চরমে উঠিয়াছিল। কেননা ইহারই মধ্যে কাজী সাহেবের জীবন একবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শহরের প্রধান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধতায় সমাজের কার্যচালনা ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিল এবং এই দলাদলি লইয়া ঢাকার মুসলিম সমাজে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহার দরুন স্বাভাবিক জীবন যাপনই যেন অসহজ হইয়া আসে। নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যখন কোমর বাধিবার প্রয়োজন তখন এই গৃহবিবাদ কোন ক্রমেই মঙ্গলের নহে। কাহারও কাহারও মনে এই শুভ বুদ্ধি এই সময়ে দেখা দেয়। এবং সেইজন্য উভয় দলে একটা মিটমাটের চেষ্টা চলে। বলিয়াদির জমিদার বাড়ীতে ইহারই উদ্দেশ্যে একটা বৈঠক হয়। কিন্তু মিটমাটের নামে এখানে সমাজ-পক্ষকে বিপক্ষ দল আপনার প্রাধান্য বলে ধমকাইবার চেষ্টা করে। তাহাতে সেখানে কোন প্রকার মীমাংসা সম্ভব হয় না, এবং গোলমালের মধ্যেই সে বৈঠকের শেষ হয়। কিন্তু মিলনের চেষ্টাটা চলিতে থাকে এবং একদিন অবশেষে তাহার কিছুটা সম্ভবও হয়। নিজেদের আন্দোলন চেষ্টায় সমাজপক্ষ লোক-সাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাহারই দরুন মুসলমানের মধ্যে যখন সঙ্ঘবদ্ধতার একান্ত প্রয়োজন তখন দল বিভাগের সৃষ্টি করিতেছে এই অভিযোগ আনিয়া বিপক্ষদল তাঁহাদিগকে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলিতেছে এবং আর এমন আন্দোলন তাঁহারা

চালাইবেন না তাহার প্রতিশ্রুতি চাহিতেছে। অভিযোগ অন্যায় সন্দেহ নাই, তবু সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ যখন উগ্র হইয়া ওঠে শাশ্বতের সাধনাকে তখন পথ ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। এখানেও তাহাই হইল। অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব কর্ম্মী লোক, কর্মই ছিল তাঁহার সাধনা, তাই তাঁহার মনে বিশেষ কোন দ্বিধা হয়তো ছিল না, হয়তো তিনি ভাবিলেন মুসলিম জনগণের কল্যাণই যদি কাম্য তবে সে কর্ম্ম সাধনায় যে ভাবেই হোক্ আপনাকে নিয়োজিত করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, কিংবা হয়তো বা সাময়িক উত্তেজনাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া লইবার বাসনাই তাঁহার অন্তরে তখন ছিল। তিনি তাঁহার লেখার ভাষাগত ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত কাজী সাহেব স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা লব্ধ সত্য-সম্পদের প্রতি অন্তরের নিষ্ঠাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু এই সময়কার তাঁহার লেখার মধ্যে এই মিলন সমর্থনের প্রয়াস আছে, বাহিরের ছাত্র-সমাজের অনেকের মনে এই সন্দেহ জাগে। অবশ্যই উপস্থিত অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজী সাহেব আপনার উৎসাহ-উদ্যোগকে কিছু সংযত করিয়া লইয়া বসেন এবং ইত্যাকার গোলমালের দরুণ সমাজের কার্য্যে শিথিলতা দেখা দেয়। নিয়মিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতি আর পূর্বের মত হয় না। অবশেষে এমনি দাঁড়াইল যে শুধু ইহার বার্ষিক অনুষ্ঠানই হইত এবং ইহারই আয়োজনের জাঁকজমকের মধ্যে সমাজের কর্ম্ম চাঞ্চল্যের সামান্য পরিচয় মিলিত। কিন্তু ইহাও বন্ধ হইয়া আসিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনের সঙ্গে। এই অব্দে সমাজের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং সেখানে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময়েই মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রী দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিল। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ বার বছর বয়সে অকাল মৃত্যুবরণ করে।

সমাজকে লইয়া এই গোলমাল বোধ হয় এক সময়ে চরমে উঠিয়াছিল। সমাজের অন্যতম এক ছাত্র সদস্যের ব্যাপার লইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সদস্যের নাম শামসুল হুদা। ইনি তৎকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহারই বক্তব্য বিষয় লইয়া ঢাকা নগরী বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এবং সে বিক্ষোভের আঘাত অত্যন্ত বিকট হইয়া দেখা দেয়। এমনি তাহাদের আক্রোশ যে প্রবন্ধ লেখককে তাহারা বধ করিতে না পারিলে তাহাদের মনের ক্ষোভ মিটিবে না এবং তাহারই আয়োজনে তাহারা ফিরিতে থাকে। কাজী সাহেব যদি এই সময়ে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও শক্তি দ্বারা ইঁহাকে রক্ষা করিতে তৎপর না হইতেন তবে বোধ হয় ইঁহার বাঁচিবার আর ভরসা ছিল না এবং তাহাই করিতে যাইয়া কাজী সাহেব নিজেকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কারণ অন্যায়ের

সমর্থনকারী সন্দেহে ইহাদের আক্রোশ তাঁহারও উপর গিয়া পড়ে। যাহা হউক, হুদা সাহেবের উপর কিছু সামাজিক শাস্তি বিধানের পর এই ব্যাপারে শান্তি হয়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কাজী সাহেব পদোন্নতি লাভ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ঢাকার অশান্ত অবস্থার মধ্য হইতে চলিয়া আসিয়া নিরুপদ্রব নিরিবিলিতে তিনি সাহিত্যচর্চা করিতে থাকেন এবং সেইভাবেই তিনি ইহার সাধনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের আক্রমণ ভীতিতে তাঁহাদের অফিস যখন রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনিও সেই সঙ্গে চলিয়া যান। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার ফিরিয়া আসেন। যেখানেই যান না কেন, যে সাহিত্য সাধনা ও চর্চ্চাকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কথা কখনও ভুলেন নাই। কোন প্রকার আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লইয়া বা কোন বিক্ষুব্ধ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া তিনি নিজেকে তাঁহার সাধনাকে আর বিব্রত করেন নাই। নীরবে ইহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এবং ইহারই মধ্যে যে কয়খানি পুঁথি পুস্তক তিনি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যও যেমন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, আপনার সাধনা শক্তির পরিচয় দিয়া তেমনি নিজেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার এ শক্তির শেষ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তিনি এখনও ব্রত সাধনায় রত রহিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহারা এই সাধনাকে অবলম্বন করিয়া সারা জীবন ধরিয়া একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কাজী সাহেব অন্যতম। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি তাহা করিয়া যাইবেন এই আমাদের বিশ্বাস। আর সেক্ষেত্রে আমরা এবং আমাদের সাহিত্য যে তাঁহার হস্ত হইতে অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

১। *মীর পরিবার*। ৫টি ছোট গল্প। ১৩২৫ সালে (১৯১৮) নূর লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে মঈনুদ্দিন হোসেন প্রকাশ করেন।

২। *নদীবক্ষে*। উপন্যাস। ১৩২৬ সাল (১৯১৯)। মুসলমান চাষী জীবনের বিশেষ পরিচয় এমন করিয়া ইহার পূর্বে আর কেহ লেখেন নাই। এই পুঁথি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

৩। *নব পর্য্যায়*। প্রবন্ধ। ১৩৩৩ সাল, আষাঢ়।

৪। *রবীন্দ্র কাব্য পাঠ*। রবীন্দ্র কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৩৩৪ সাল।

৫। *নব পর্য্যায়*। ২য় খণ্ড। প্রবন্ধ। ১৩৩৬ সাল।

৬। *সমাজ ও সাহিত্য*। প্রবন্ধ। ১৩৪১ সাল।

৭। *হিন্দু মুসলমানে বিরোধ।* প্রবন্ধ। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে "নিজাম বক্তৃতা" হিসাবে শান্তিনিকেতন তিনটি বক্তৃতা (২৬শে, ২৭শে ও ২৮ শে মার্চ) দেন। তাহারই সমষ্টি এই পুঁথি। প্রকাশ ১৩৪২ সাল, মাঘ মাস (১৯৩৬ খ্রীঃ)। বিশ্বভারতী প্রকাশক।

৮। *পথ ও বিপথ।* কথোপকথনের আকারে রচিত বিভিন্ন সমালোচনা। ঢাকা থাকিতেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পুঁথি লেখা হয়। তবে কলিকাতা আসিবার পর ১৩৪৬ সালের মাঘ মাসে (১৯৪০, জুলাই) বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুঁথি প্রকাশের সময় সরকারী বাধা আসিবার উপক্রম হয় এই অনুমানে যে ইহাতে রাজদ্রোহের পরিচয় আছে। স্বায়ত্তশাসনের তৎকালীন সহসেক্রেটারী মিঃ এ, বি, চ্যাটার্জ্জির মন্তব্যে সে সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার দরুণ যথারীতি পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

৯। *আজকার কথা।* প্রবন্ধ। উপস্থিত সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা। ১৩৪৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স।

১০। *কবিগুরু গ্যেটে*-১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স। অফিসের স্থানান্তরের ফলে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজশাহীতে যান তাহার পর হইতে রাজশাহীতে তিন বছরের পূর্ণ পরিশ্রমে এই দুই খণ্ড পুথি লেখা হয়। প্রকাশ হয় কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার পর।

১১। *তরুণ।* তিনটি ছোট গল্প ও একটি নাটিকার সমষ্টি। ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৮ খ্রীঃ, আগষ্ট)। কিন্তু লেখাগুলি ইহার বহু পূর্ব্বের। প্রকাশক নূর লাইব্রেরী।

১২। *আজাদ।* উপন্যাস। পরিকল্পিত পুঁথির প্রথম খণ্ড। লেখা হইয়াছিল বহু পূর্ব্বে এবং *জয়তী* ও *বুলবুলে* প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫, আষাঢ় (১৯৪৮, সেপ্টেম্বর) প্রকাশক নূর লাইব্রেরী। শেষোক্ত পুঁথি দুইখানির প্রকাশ কবি আব্দুল কাদিরের উৎসাহ ও উদ্যোগেই মাত্র সম্ভব হইয়াছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কন্‌ফারেন্সে তিনি এক বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতা লেখা হইয়াছিল বাঙ্গালায়। সকলের বোধগম্য করিবার জন্য ইহার ইংরেজী তর্জ্জমা সম্মেলনের বৈঠকে প্রচার করা হয়। (এই অনুবাদ করিয়াছিলেন অধ্যাপক তারকনাথ সেন)। ইহাতে তিনি যে প্রশংসা পান তাহার দরুণ তিনি আপন পাঠকগোষ্ঠির একটা বিস্তৃতি অনুভব করেন। এই অনুভূতিই তাঁহাকে নিজের কতকগুলি প্রবন্ধের ইংরাজী তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার প্রেরণা আনিয়া দেয়। ১৯৪৭-এর অক্টোবর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কার্য্যেই তিনি রত আছেন।

ইহার সঙ্গে আরও একটি কাজ তিনি হাতে লইয়াছেন। পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জীবনী রচনা। ইহা তাঁহার একটি বহুদিনের সাধ ও পরিকল্পনা। হজরত মোহাম্মদের চরিত্র ও শিক্ষার আলোচনা করিয়া সহজ ও স্পষ্ট দৃষ্টিতে এই

মহাপুরুষের সুষ্ঠু পরিচয় দান তাঁহার ইচ্ছা, যাহাতে সংস্কারমুক্ত হইয়া সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া মুসলিম বাঙ্গালী যথার্থভাবে তাঁহাকে চিনিতে পারে। এমনি চরিত্র ও শিক্ষার সমালোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি সুবিস্তৃত জীবন রচনাও তাঁহার অপর একটি পরিকল্পনায় রহিয়াছে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির রচনাই তাঁহার উপস্থিত আকাঙ্ক্ষা।

অর্জন ও প্রতিষ্ঠা

সাহিত্যক্ষেত্রে কাজী সাহেব নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুন্ন যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একবার কোন সাহিত্য বৈঠকে কাজী সাহেবের সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাবে বলেন যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই সাহিত্যবাসরে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন; কাজেই তাঁহার শক্তি ও পদাধিকারের দাবী সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ বা আপত্তি থাকিতে পারে না। কথাটির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের যিনি খবর রাখেন তিনিই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সত্যই কি হিন্দু-মুসলমান উভয় সাহিত্যিক সমাজে কাজী সাহেবের সাহিত্য সাধনার কৃতিত্ব সসম্মানে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ তিনি 'নিজাম বক্তা' নিযুক্ত হইয়া শান্তিনিকেতনে যান এবং সেখানে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। তখন দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও যেন তাহা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই গোলমালের দরুণ এ অধিবেশনে যোগদানের ক্ষেত্রে তাঁহার বাধা আসে। তিনি প্রথম দিন সভায় যোগ দিতে পারেন নাই, তবে দ্বিতীয় দিন গিয়া তিনি যথারীতি সম্মেলনে আপনার নির্দিষ্ট কাজটুকু করেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনার কথা আছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবরে পি ই এন-এর উদ্যোগে জয়পুরে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের (All India Writers Conference) এক অধিবেশন হয়। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের জন্য কাজী সাহেব সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া যান। তিনি সেখানে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার দরুন প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। এমনিভাবে তিনি বিভিন্ন স্থলে আপন প্রতিভা শক্তির জন্য সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার

নিরহঙ্কার অমায়িক লোক তিনি। সারল্য তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পিতার সহজ সুন্দর আভিজাত্য তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার সঙ্গে

একবার আলাপ পরিচয় করিয়াছেন তিনি তাঁহার এইভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ভদ্র মনোভাব ও ভদ্র ব্যবহার তাঁহাকে সহজেই অন্যের নিকট প্রিয় করিয়া তোলে। পিতার নিকট হইতে তিনি আরও একটি গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেটি হইল তাঁহার অদ্ভূত স্মৃতিশক্তি। মাতার বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মায়েরই প্রকৃতিতে তাঁহার প্রকৃতি গড়া। বুদ্ধির প্রখরতা তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধের দিকে, আর বিবেচনাবোধ তাঁহার চারিত্রিক সুষ্ঠু সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। আর এই দুইটি সম্পদই তাঁহার চরিত্র ও প্রকৃতির প্রধান গৌরববস্তু। বিচার বিবেচনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ সম্পর্ক হিসাব করিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি ছিল বলিয়া এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পরও তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার স্থান পায় নাই।

অপর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার চরিত্রে গোঁড়ামীর একান্ত অভাব। গোঁড়ামীটা কোন দিনই তাঁহার নিকটে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় নাই। আর পনের বছর বয়সেই এই বোধটুকু তাঁহার হইয়াছে যে গোঁড়ামীকে কোন ক্রমেই আমল দেওয়া উচিত নয়। তাঁহার এই মনোভাব গড়িয়া উঠিবার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বর্তমান ছিল। মা, দাদী, বাবা, চাচা, দাদা ইত্যাদির চরিত্রে কোন বিশেষ প্রথা বা নিয়মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া কোন প্রকার অন্ধত্ব বা একগুঁয়েমি ছিল না। আর তাঁহাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার জন্য তাঁহার উপর কোন চাপ আসে নাই। সংসারে মানুষ হইবার কালে অন্যের মতামতকে মানিয়া চলিবার জন্য কোনখান হইতে কোন রকম বাধ্যবাধকতা ছিল না। সেইজন্য নিজের রীতি প্রকৃতি নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার কালে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই একদিকে যেমন তাঁহার মধ্যে মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি গোঁড়ামীর কথা ভাবিয়া দেখিবার তিনি অবসর পান নাই। গোঁড়ামীহীনতার জন্যই তিনি জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল লোকের সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে আচার ব্যবহার প্রভৃতি চরিত্র পরিচয়ের সুষ্ঠুতার দিকে স্বাভাবিক রুচিবোধ থাকার দরুণ তাঁহাকে আপাতদৃষ্টিতে দাম্ভিক বলিয়া মনে হয় এবং অনেকের মনে নূতন পরিচয়ে কুণ্ঠা আসে, কিন্তু তাঁহার মুখের হাসিটি একবার দেখিলেই সে ভাব দূর হয়, এবং মানুষটিকে একেবারেই চিনিয়া ফেলা যায়।

উপসংহার

সম্প্রতি কাজী সাহেব একটি গুরুতর পীড়ায় দীর্ঘদিন ভুগিয়া উঠিয়াছেন। বর্তমানে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ। ধীরে ধীরে পুনরায় হাতের কাজগুলি করিবার চেষ্টায় রত হইতেছেন। দেহ তাঁহার শক্ত কাঠামোর উপরেই গঠিত। খোদাতায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘ

জীবন দান করুন এই আমাদের কামনা; এবং তিনি তাঁহার হাতে যে কয়েকটি কাজের পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিয়া আমাদের ভাষা সাহিত্যের সম্পদ ও জাতির গৌরববৃদ্ধি করুন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার মত সাধক বাঁচিয়া থাকিলে আমরা অশেষ লাভবান হইব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একটি কথা এই সঙ্গে বলিয়া রাখা যায় যে মুসলিম সমাজের একদল আজিও তাঁহাকে আপনাদের নিকটে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে এবং সমাজের তিনি এক মূর্ত্তিমান অকল্যাণ ভাবিয়া সাবধানে তাঁহার সাহচর্য্য বর্জন করিয়া চলে। তবে কাজী সাহেবের গর্ব এই যে, তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া ইঁহারা নিজেদের বক্তব্য যদি প্রতিষ্ঠা করিতে যায় বা চায় তাহা হইলে তিনি কি বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহার খবর ইহাদের অবশ্যই করিতে হইবে তথা পড়িয়া দেখিতে হইবে।

টীকা

এই পত্র ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর* মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। *মীর-পরিবার* প্রকাশের ফলে আর একটি লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচিতি ঘটে যাহার দরুণ সাহিত্যিক জীবনে তিনি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিয়া ছিলেন। ইনি হইলেন তৎকালের বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম পাঠক-শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়। ইঁহারই সঙ্গে পরিচয়ে, আলাপ-আলোচনায় ও পাঠের প্রতি ইহার উৎসাহে কাজী সাহেবের পাঠের ক্ষেত্র প্রসারতা লাভ করে। পরবর্তীকালে গ্যেটে প্রভৃতি কবির কাব্যালোচনায় তাঁহার যে কৃতিত্বের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহার উৎসমূল এখানেই, ইহা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। ইহার সঙ্গে পরিচয়ের যে কাহিনী জানা যায় তাহা অদ্ভুত মনে হইলেও উপভোগ্য বটে। *মীর-পরিবার* পুঁথি পাঠ করিয়া সেন মহাশয় কাজী সাহেবকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ পত্র লিখিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা জানান, এবং কোন দিন ও ক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া প্রস্তাব করেন যে ঐ দিনে ও সময়ে কাজী সাহেব গোল-দীঘিতে যাইবেন, সেন মহাশয় সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাছিয়া লইবেন। এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে কাজী সাহেব স্তম্ভিত হন সন্দেহ নাই, কিন্তু *রোমান্স*-প্রবণতা প্রত্যেকেরই জীবনে বিশেষ করিয়া যৌবনে, কিছু না কিছু থাকেই। তাই তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রস্তাব মোতাবেক গোলদীঘিতে গিয়া হাজির হন। কাজী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহাদের পরস্পরকে খুঁজিয়া পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, এবং এই ভাবেই তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয়।